আমার একাত্তর

ক'দিন ধরে চার দিকে একটা গুমোট থমথমে ভাব। একটা কিছু ঘটবেই এমন একটা বিশ্বাস সবার মনে, কিন্তু কখন এবং কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না। আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার কালো মেঘে ঢাকা পরে আছে পুরো দেশ । পুরো পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারী। গোটা দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে, একটা জোড় লড়াই হবে। ইতিমধ্যেই দু'এক জায়গায় ছোটখাটো মহড়া হয়ে গেছে। বিহারীরা (আমাদের উত্তর দিকে থাকে) খোলা তলওয়ার নিয়ে তেড়ে এসেছিলো, বাংগালীরা ইট, পাথর আর বাঁশের লাঠী নিয়ে রুখে দিয়েছে।
'৭১ এর শুরুর দিকেই মিরপুরের উত্তরাংশে (১নাম্বার সেকশন থেকে শুরু করে ১২ পর্যন্ত সব ক'টা সেকশন)বসবাসরত বিহারীদের মহল্লা গুলোতে যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। বেশ কিছু খন্ড যুদ্ধ হয়েছে ফেব্রুয়ারীতে। আমরা বাবা, মা আর বয়স্কদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট পড়তে পারি। আমরা অত ছোট নই যে কিছুই বুঝি না আবার অত বড়ও নই যে সব বুঝি। কি এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। কি করবো ভেবে পাই না। ইতিমধ্যে মহল্লার মুরুব্বিরা বেশ ক'বার মিটিং করেছেন। অপেক্ষা করছেন রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশের।

৭ মার্চ এ বংগবন্ধুর সেই আগুনে ভাষনের পর দিন হঠাৎ করেই আমাদের ব্যাডমিন্টন কোর্ট দখল করে ফেললো এক দল যুবক। কপালে সবুজ ফিতে বাধা,তাদের সবার হাতে লম্বা লাঠি। কারো কারো কাঁধে তীর ধনুকও দেখা গেলো। বিস্ময় আর কৌতুহলে আমরা তাদের সাথে আঠার মতন সেঁটে থাকি। জানা গেলো এরা স্বেচ্ছাসেবক, নেতার আদেশ অনুযায়ী ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলবে। দেশ রক্ষায় এরা সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি। মুসলিম হাবিলদার আমাদের এই অঞ্চলের কমান্ডার। মুসলিম হাবিলদার- তিনি কোন সসস্ত্র বাহিনীতে নেই, ছিলেন কী না কেউ জানে না, তিনি কবে হাবিলদার ছিলেন সেটা জানারও কারো তেমন আগ্রহ নেই। ঈর্ষণীয় কমান্ডিং ভয়েসের অধিকারী এই হাবিলদার সাহেব আমাদের সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তার নির্দেশে ব্যাডমিন্টন কোর্ট এবং পাশের আরো কিছু খালি মাঠে তৈরী হলো ট্রেনিং কম্পাউন্ড। শীতের সন্ধ্যায় চারদিক থেকে আসছে তরুণ, যুবকেরা। মাথায় সবুজ ফেট্টি বাঁধা হাতে লম্বা লাঠি। সে এক মহা দজ্ঞ যজ্ঞ ব্যাপার। চার দিকে জোরালো আলো জ্বালিয়ে হাবিলদার সাহেবের নেতৃত্বে অনেক রাত অবধি চলে এই ট্রেনিং। ছোট বলে আমাদের সরাসরি অংশগ্রহন নিষিদ্ধ হলেও আমরা তাদের এটা ওটা এগিয়ে দিতে পারলেই বর্তে যাই।

ব্যাডমিন্টন শিকেয় উঠলো। অবশ্য সেটাও যে নিয়মিত খেলতে পাই তাওতো নয়। বড় ভাইয়েরা খেলে আমরা তীর্থের কাকের মতন সাইড লাইনে বসে থাকি, যদি কারো পার্টনারের শর্ট পরে । তবে সে ডাক আর আসে না। পার্টনার ঠিকই যোগাড়

হয়ে যায়। বরং বহু ব্যবহারে জর্জরিত, পালক খসে পড়া কোন একটা শাটল কক কুড়িয়ে পাওয়া গেলে সেটাই হয় আমাদের বড় অর্জন। তো, সেই রকম এক সন্ধ্যা বেলায় প্রচন্ড শোরগোল । চিৎকার, হৈ চৈ আর ছুটন্ত মানুষের মাঝ থেকে জানা গেলো বিহারীরা আমাদের পাড়া আক্রমণ করেছে। যুদ্ধের উত্তেজনা মিইয়ে গিয়ে আমরা ভয়ে কাঠ । মা বাবা আমাদের নিয়ে গিয়ে উঠলেন পাশের মসজিদের ছাদে। ভরসা এই যে, ওরা মসজিদ আক্রমণ করে না। আক্রান্ত হবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে শুধু মসজিদই নয় সব ছাদের উপরেই জমানো হয়েছিলো প্রচুর ইট পাথর আর কাঁচের বোতল। এসব জমানোর কাজে আমাদের ভুমিকাই ছিলো বেশী । তো সেই রাত আমরা বেশ ক'টি পরিবার বাচ্চা কাচ্চা সহ ঐ মসজিদের ছাদেই কাটালাম। স্বেচ্ছাসেবকরা মহল্লায় পাহাড়া দিলো। অনেক পরে জানা গেলো ওরা আমাদের এই মহল্লায় আসে নি। এ রকম আতঙ্ক আর উৎকন্ঠা নিয়ে বেশ কয়েকদিন আমরা মসজিদের ছাদে গিয়েছিলাম।

২৫ মার্চ ১৯৭১। গোলাগুলির শব্দে রাতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শব্দগুলো আসছিলো বেশ দুর থেকে। আতঙ্ক আর উৎকন্ঠায় রাত কাটলো। ২৬ মার্চ সকালে গোলাগুলির শব্দ কাছে চলে এলো। একটানা গুলির শব্দ। এরকম টানা অবিশ্রান্ত গুলির শব্দ কখনো শুনি নি। শোনার কথাও নয় । বড়রা বললেন 'ব্রাশ ফায়ার'। নানা রকম শব্দে গুলি চলছে তো চলছেই। বাতাসে শীশ কেটে খুব নীচু দিয়ে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। আমাদের আশে পাশের বাড়ীর দেয়ালে বুলেটের গর্ত তৈরী হতে দেখে মা চৌকির নীচে আমাদের বিছানা করে দিলেন। প্রায় পুরো দিনই কাটলো চৌকির তলায়। পরদিন সকালে দেখা দিলো অন্য রকম বিপর্যয়। উত্তর পশ্চিম কোণ, যেখানে কাল বৈশাখীর মেঘ দেখে আমরা অভ্যস্ত, সেখানে দেখা গেলো ঘন কালো ধোঁয়া। দিন বাড়ার সাথে সাথে আগুনের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করলো। এক সময় পুরো উত্তর আকাশ ছেয়ে গেলো কালো ধোঁয়ায়। এটা করছিলো পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগী বিহারীরা। তারা একের পর এক বাংগালীদের বাড়ী ঘরে আগুন দিচ্ছিলো সেই সাথে চালাচ্ছিলো লুটপাট। উত্তর দিক থেকে পালিয়ে আসতে শুরু করলো বাংগালীরা। প্রথমে একটা দুটো পরিবারকে দেখা গেলো মাথায় পোটলা পুটলী নিয়ে খুব দ্রুত আমাদের পাড়ার উপর দিয়ে চলে যেতে। তাদের শিশু কিশোরদের হাতে দড়ি বাঁধা ছাগল (টানতে হচ্ছে না, সে নিজেও আতঙ্কে দৌড়াচ্ছে), কোলে ঝুঁটি ওয়ালা লাল মোরগ আর চোখে কান্নার জল। আগে যা ছিলো একটা দুটো পরিবারের নিরুদ্দেশ উদ্বিগ্ন যাত্রা কিছুক্ষণের মধ্যেই তা রূপ নিলো এক বিশাল মিছিলে। এই মিছিলের যেন আর শেষ নেই। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ মানুষও কিছু না কিছু বহন করছে। পলায়নপর ছুটন্ত কিছু মানুষকে আমরা পানি দিলাম। একটু থেমে যে খানিকটা বিশ্রাম নেবে তার কোন আগ্রহ কারো মধ্যেই দেখা গেল না। যেন থামলেই মৃত্যু। কেবল ছুটে চলা। আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখে আমাদের পাড়া খালি হয়ে গেলো দুপুরেই। বিকেলের দিকে আমরাও মিশে গেলাম ছুটে চলা ঐ মানুষের কাফেলায়। বাবা মার হাতে কাপড় চোপড় আর খাবারের পোটলা, ভাইয়ের হাতে রেডিও, আমার হাতে একটা পাখির খাঁচা। একটা টিয়া পাখী ওতে। টিয়েটা কথা বলে। পাড়া পড়শী সহ আমরা সবাই ছুটছি দক্ষিন দিকে।

অধিকাংশেরই সঠিক গন্তব্য জানা নেই। কেউ কেউ বলছে নদী (?) পার হয়ে ওপারে আটী যাবে। আমরা কোথায় যাবো এখনো জানি না। পথে মুসলিম হাবিলদারের সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনিও আমাদের মতই পথে নেমেছেন, খানিকটা বিভ্রান্ত, গন্তব্য জানা নেই।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা মধ্য পাইকপাড়ায় এলাম। এখানে একটা বড় মসজিদ আছে। আরো কিছু লোকের সাথে বাবা মাগরিবের নামাজ পড়লেন সেই মসজিদে। সেখানে এক দয়ালু মুসুল্লি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। মসজিদের পাশেই তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন আমাদের দলটাকে। নিকটাত্মীয়ের মতন আপ্যায়ন করলেন ঐ বাড়ীর প্রতিটা লোক। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত আর মেঝেতে ঢালাও বিছানা পেয়ে আমরা পথের সব ক্লান্তি আর আতঙ্ক ভুলে যাই। ‘ভুইয়া বাড়ী’র সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পর দিন সকালে আবার আমাদের পথ চলা শুরু হলো। অনেকটা পথ হেটে বাংলা কলেজের পুব দিকে একটা নির্মানাধীন তিন তলা সরকারী দালান পেলাম। দরজা জানালা এখনো লাগানো হয় নি। পানি বিদ্যুতের প্রশ্নই আসে না। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে, এখন এই অসম্পূর্ণ দালানই আমাদের কাছে প্রাসাদ । একটা রাত কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। আমরা সকালে আবার পথে নামবো। সন্ধ্যা নামতেই আতঙ্ক আমাদের সবাইকে গ্রাস করলো। ঘোর অন্ধকার তবু আলো জ্বালানো চলবে না। ইট কাঠ বালি শুরকী সরিয়ে মা বিছানা পাতলেন। দোতালার কপাটহীন জানালা থেকে আবছা আলো আঁধারিতে দেখলাম দুরে মশাল হাতে ছুটে ছুটে বাঙালীদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বিহারীরা। রাতটা কাটলো চরম আতঙ্কের মধ্যে। সকাল হতেই আমরা সেই বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পরি। রাস্তায় নেমেই দেখি বাংলা কলেজের পেছন থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশ ঢেকে ফেলছে। আওয়ামী লিগের এম পি এস এ খালেকের বিউটি সিনেমা হলে আগুন দিয়েছে বিহারীরা। বেশ কিছুক্ষন দক্ষিনে হাটার পর কল্যানপুর বাস ডিপো। আমরা ওখানে যেয়ে দেখি আমাদের মতন বেশকিছু পরিবার বাসের জন্য অপেক্ষা করে আছে। অনেক অনূরোধের পর একটা বাস বের হলো ডিপো থেকে। শহরে যাবার সেটাই সেদিনের শেষ বাস।

আমাদের মতন আরো কিছু আতঙ্কগ্রস্থ পরিবার আমাদের সহযাত্রী। কলেজ গেট, আসাদ গেট আর ফার্মগেট ছাড়িয়ে মগবাজারের দিকে মোড় নিতেই দেখি রাস্তার মোড়ে আবর্জনার স্তুপের উপর বেশ ক’টা মরা কুকুরের সাথে উপুর হয়ে আছে কিছু মানুষের ফুলে ওঠা শরীর। এতক্ষণ আমরা বাসের জানালা দিয়ে প্রিয় চেনা শহরের বিদ্ধস্ত রূপ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। আগুনে পোড়া বাসের কঙ্কাল, গুলিতে ঝাঝড়া দেয়াল আর দোমড়ানো রিক্সা এ সবের মধ্যে মৃত দেহ ছিল না। দৃশ্যপটে মানুষের মৃত দেহ চলে আসতেই আমাদের জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হলো।

আমাদের আশ্রয় মিলেছে পুরনো ঢাকায় নানা বাড়ীতে। সবাই যখন শহর ছেড়ে উদভ্রান্তের মতন গ্রামের দিকে ছুটছে আমার বাবা মা কেন শহরের ঠিক কেন্দ্রের দিকে আমাদের নিয়ে গেলেন সেটা বোঝা গেল না। হয়তো মা’র পরিকল্পনা ছিলো

মরতে হলে সব ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সহ একসাথে মরবেন। বাবার সুবিধা ছিল, তিনি হেটেই অফিস করতে পারতেন। আমার মা'র ভাই বোনের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতন। এগারো জন। আমরা বলতাম ফুটবল টিম। নানীর অন্য মেয়েরাও তাদের ছানা পোনা নিয়ে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত, সঙ্গে আমরা যোগ দেয়াতে ফুটবল টিম দর্শক ভর্তি পুরো স্টেডিয়াম পেয়ে গেলো। সারাক্ষন বাড়িতে হৈ চৈ , শোরগোল লেগেই আছে। সম বয়েসি খালাতো ভাই বোন পেয়ে আমাদের সবার পড়াশোনা শিকেয় উঠলো। সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। বাইরে দেশজুড়ে যুদ্ধ চলছে তা আমাদের দেখে কে বলবে।

তবে রাতে খুব তাড়াতাড়ি সব নিঝুম হয়ে যায়। এরই মাঝে সন্ধ্যা বেলায় আমাদের সেনোরা রেডিও ঘিরে বাবা আর মামাদের জটলা বসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বলে নতুন এক রেডিও স্টেশান আবিষ্কার হয়েছে। ওরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে। এম আর আখতার মুকুল নামে একজন ঢাকাইয়া উচ্চারনে চরমপত্র বলে একটা অনুষ্ঠান করেন। খুবই জনপ্রিয় এই রসালো অনুষ্ঠান শোনার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের ঘরে গোপন উৎসব হয়। মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের খবরে রেডিওকে ঘিরে থাকা মানুষ গুলোর চেহারাগুলো ঐ আবাছায়া আধারেও উজ্জল হয়ে ওঠে।
রাত একটু গাঢ় হলে দুর থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। হঠাৎ কাছেই বিকট শব্দে বোমা ফাটে। মহল্লার কুকুরগুলো সারা রাত চ্যাচায়। এক সময় ওরাও তাদের চ্যাঁচানো থামিয়ে দেয়।

আমাদের ঘুমানোর কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। যখন যেখানে সুযোগ মেলে সেখানেই শুয়ে পড়ি। বেশিরভাগ সময়েই আমরা নানীর ঘরে ঘুমাই। নানী, খালা আর বাচ্চা কাচ্চা প্রায় সবাই এ ঘরেই ঘুমাতে চায়। শোবার জন্য খাট বা চৌকি'র প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত ঘর জুড়ে ঢালাও বিছানা হয়। আমরা দুই ভাই ঘুমাই নানীর প্রকান্ড পালঙ্কের নীচে। বেশ অনেকটা জায়গা ওখানে পরিষ্কার করে রাখা, আমাদের বেশ ভালোই ঘুম হয়। হঠাৎ বড় আর মেঝ খালা তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে উপস্থিত হলে পালঙ্কের নিচে ছোটখাট উৎসব হয়ে যায়। আদা-রসুন, চাল ডালের বড় বড় বস্তার পাশে আমরা চার পাচটা মানব সন্তান ঠিক ঠাক এটে যাই। আমাদের গল্প আর ফুরাতে চায় না, বড়দের ধমক খেয়ে সেটা ফিসফিসানিতে রুপান্তরিত হয়। সমস্যা একটা হয় বটে, মধ্য রাতে যখন কেউ বাথরুমে যেতে চায়। আলো আঁধারিতে কারো গায়ে লাথি গুতো না মেরে দরজা পর্যন্ত যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ঘরের পুরোটা মেঝে জুড়ে কেবল মানুষ, ঘুমন্ত মানুষ। দেয়ালের বড় ঘড়িটা সময় গুনে যায় ঠক- ঠক, ঠক-ঠক। নিরবিচ্ছিন্ন এক ঘেয়ে এবং কখনো ভৌতিক ঐ শব্দ নৈঃশব্দকে আরো প্রকট করে তোলে।

আমাদের রাতে ঘুমানোর সময়ের নিয়মিত এবং নিরবিচ্ছিন্ন ফিস ফাসে আমার নানী আর খালারা এ্যাত বেশী বিরক্ত হলেন যে, তাদের ঐ ঘরে আমাদের শোয়া নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হলো। আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো মামাদের ঘরে। ছোট মামা ছাড়া আর কোন মামার সাথেই আমাদের তেমন একটা কথা হয় না। আমাদের সাথে কথা বলাতে তাদের সবারই অপরিসীম বিরক্তি। ভাব খানা এমন যে পুচকে

ছেলে পিলেদের সাথে আর কি কথা বলবো। তবে, আমি আরো একটা মামার খুব ভক্ত, শফিক মামা। খুব ফুর্তিবাজ হলেও আমাদের সাথে তার কথাবার্তাই নেই। খুব সুন্দর তার হাতের লেখা। মিনিটের মধ্যে চমৎকার সব নক্সা আকেন। এমন শিল্পীসুলভ হাতের লেখা আমাদের এলাকায় কখনো দেখি নি। কলতাবাজার, লক্ষ্মীবাজার আর নারিন্দার সব দেয়াল লিখন আর পোষ্টার শফিক মামার লেখা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চতৈরীতে এপাড়া ওপাড়া থেকে ডাক আসে। পাড়ার ক্লাবে তিনি খুব জনপ্রিয়। আমি গোপনে তার হাতের লেখা নকল করি। আমাদের মামাদের মাঝে সব চেয়ে অ জনপ্রিয় হলেন বড় মামা । তিনি এমনই এক কঠোর ভাব নিয়ে চলেন যে আমরা তার থেকে শত গজ দুরে থাকি। মা'রা তাদের অবাধ্য ছেলেদের শাসন করতে তাকে ডাকেন। তিনি একা পুরো একটা ঘর নিয়ে থাকেন । ভাগ্না ভাগ্নি দুরে থাক তার ভাই বোনদেরো ঐ ঘরে ঘুমানো মানা।

আমাদের দুই ভাইয়ের জায়গা হলো মেঝ ,সেঝ আর শফিক মামার ঘরে। মামাদের ছবির ব্যবসা। লক্ষ্মীবাজারে তাদের একটা স্টুডিয়ো আছে। 'ডান্ডি কার্ড' এর জন্য এখন প্রচুর ছবি তোলা হচ্ছে। শুধু আইডেন্টি কার্ডই নয়, হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজেও ছবি দরকার। ইদানীং প্রচুর মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টে, জেল খানার দরজায় প্রিয়জনের ছবি নিয়ে লোকজন ঘুরছে, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। মামাদের ব্যবসা বেশ রমরমা বলা যায়। সারাদিন বড়মামা আর তার সহকারী যে সব ছবি তোলেন, রাতে মেঝ মামা সেই সব ছবি প্রসেস করেন। নিজেদের শোবার ঘরকে অন্ধকার করে তৈরী করা হয় ডার্করুম। লাল আলো জ্বেলে খুব গম্ভীরভাবে একটার পর একটা ছবি প্রিন্ট করেন। অনেক রাত পর্যন্ত চলে আলো আর আধারের এই রহস্যময় খেলা। ডার্ক রুমে ছবি প্রসেস করা সে এক বড় রহস্যময় বিষয়। এনলার্জারের তীক্ষ্ণ আলোর পর সাদা কাগজটা একটা পানি ভরা ট্রেতে ডুবিয়ে রাখা হয়। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে থেকে দেখি কি করে একটা সাদা কাগজ আস্তে আস্তে একটা ছবি হয়ে যায়। অধিকাংশই মানুষের ছবি। আবক্ষ। তারা চেয়ে থাকে সরাসরি ।

বিরক্ত করছিনা তবু ধমক খেয়ে ঘুমাতে যাই। ছবি থেকে পানি ঝরানোর জন্য ঘরের এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দড়ি টানা। ক্লিপ দিয়ে ঝোলানো ছবি গুলো থেকে এক ফোটা, দু'ফোটা পানি ঝরে পড়ে। টুপ,টাপ। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে, কেবল ছবির মানুষগুলোর চোখ খোলা। ওরা চেয়ে থাকে নিষ্পলক।

বাইরের বারান্দায় বসে একটা কুকুর অনেক্ষণ ধরে কাঁদছে। খুবই করুণ সুর,অনেকটা বিলাপের মতন। বেশ কয়েকবার দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবার পরও আবার সে বারান্দায় ফিরে এসেছে। নীশিথ রাতে কুকুরের এমন কান্না নাকী অলক্ষুনে। সত্যিই অলক্ষুনে কী না জানিনা তবে আমার খুব ভয় করছে। কেমন গা ছম ছম করা ভয়। এতক্ষন এই কুকুরটি কেবল একাই কেঁদে যাচ্ছিলো, এবার তার সাথে যোগ দিয়েছে মহল্লার আরো কিছু কুকুর। এক একটা কুকুর এক এক জায়গায় বসে কাঁদছে। একটা থামলো তো আরেকটা শুরু করলো। কান্নার এই করুণ সুর এভাবে কলতাবাজার থেকে মৈসুন্ডি হয়ে নারিন্দা পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। আমার

খুব ভয় করে। নানী আর মা আজ খুব দোয়া দরুদ পড়ছেন অজানা অমংগলের আশঙ্কায়। আজ রোজার সাতাশ, মসজিদে তারাবী নামাজ পড়তে যাবার কথা কিন্তু পাকিস্তানী আর্মি ঢাকায় কার্ফু জারী করায় কারো আর আজ তারাবী নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়া হলো না। আজ যেন হঠাৎ সবাই খুব বেশী রকম চুপচাপ। অন্যদিন সবাই মিলে রেডিওতে স্বাধিন বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের খবর শোনে। খবরের পর মুক্তিযোদ্ধারা কতদুর এগিয়ে এলো তা নিয়ে ফিসফাস করে। আজ খবর শেষ হতেই যে যার ঘরে ।

আজ আর রাত জেগে ছবি তৈরী দেখতে ইচ্ছে হচ্ছেনা। মেঝেতে চট পট বিছানা বানিয়ে আমরা দু ভাই ঘুমাতে যাই। মামাদের ডার্করুমের লাল বাতি কখন নিভেছে জানি না। হঠাৎ ঘুম কেন ভাংলো জানি না। চোখ মেলতেই দেখি চকচকে কালো বুট। বড় বড় সব বুট আমাদের মুখের কয়েক ইঞ্চি দুর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে। হতচকিত আমরা মেঝের বিছানায় উঠে বসে দেখি পুরো ঘর ভরে গেছে আর্মিতে। আমি আর ভাই ছাড়া ঘরে সব কালো পোশাকের মিলিশিয়া। এ ঘরে ঘুমিয়েছিলো যে তিন মামা তাদের কেউ নেই।

উঠানের পেয়াড়া গাছ তলায় পাকিস্তানী সৈন্যরা বিচার শুরু করে দিয়েছে। বড় মামা আর শফিক মামাকে দু'দিক থেকে ধরে রেখেছে লম্বাচওড়া দুই সেপাই। একজন মেজর নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেশ করছে আর তার ইশারায় অন্য সেপাইরা রাইফেলের বাট দিয়ে মামাদের পায়ে পেটাচ্ছে। কাঠ ফাটার মতন শব্দ হচ্ছে সেখান থেকে। এক একটা আঘাতে মনে হচ্ছে পায়ের হাড় সব গুড়িয়ে গেলো আর তার সাথে শফিক মামার গোঙ্গানী যোগ হয়ে মনে হল নানীর বাড়িতে যেন নরক নেমে এসেছে। আমরা কখন কিভাবে মায়ের আচলের তলায় আশ্রয় পেলাম জানিনা। রান্নাঘরের ভেতরে আমরা। জানালা দিয়ে দেখা যায় না কিছুই কেবল মামাদের আর্তনাদ আর পাকিস্তানি সৈন্যদের গালাগাল ভেসে আসে। নানী ভালো উর্দু জানেন, তিনি এগিয়ে গেলেন ছেলেদের বাঁচাতে। একজন মেজরের কাছে ছেলেদের না মারতে তিনি হাত জোড় করে অনুরোধ করে যাচ্ছেন কিন্তু মেজর তার অনুরোধ শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। সিগারেট জালিয়ে খুব আয়েশ করে সৈন্যদের কর্মকান্ড দেখছে। নানীকে বললো তুমি চিন্তা করো না বুড়ি মা, একটু প্রশ্ন করেই তোমার ছেলেদের ছেড়ে দেব।
এদিকে আর সব সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে সব কিছু তছনছ করতে শুরু করেছে। তারা কী খুঁজছে সম্ভবত তারা নিজেরাই জানে না। আমার মা বাবা ছোট বোনটাকে নিয়ে যে ঘরটাতে থাকেন, সৈন্যরা গেল সেই ঘরে তল্লাশি করতে। একটা লেখার খাতা নিয়ে বের হয়ে এলো এক সৈন্য। খাতাটা আমার। সাদা দিস্তার কাগজ কেটে ভাঁজ করে তৈরী করা। প্রচ্ছদ তৈরী করেছি আমিই। বাজারের জনপ্রিয় খাতার কভারে ম্যাপ আঁকা থাকে, সেটা ইদানীং কেবল পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ। ম্যাপের ওপর আবার একটা যুদ্ধ বিমান। যুদ্ধ শুরুর আগে বাজারে এসবের খুব কাটতি ছিলো। এখন কোন দোকানে দেখা যায় না। আমি সাদা কাগজে ঐ কভারটা কপি করেছি। সৈন্যটা খাতাটা নিয়ে মেজরকে দিলো। সমস্ত খাতা বাংলায় লেখা। মেজর সাহেব পুরো খাতাটা উলটে পালটে দেখে খুব কষ্ট করে কয়েক লাইন বাংলা পড়লো।

বললো, এটা বাচ্চাদের স্কুলের খাতা। সৈন্যটি খাতার প্রচ্ছদের দিকে তার দৃষ্টি দিতে বলায় সেই মেজর আবার খাতাটি হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সেটি দেখলো। প্রচ্ছদে পশ্চিম পাকিস্তান নেই শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ। তার ওপর যুদ্ধ বিমান। সম্ভবত বিচ্ছিন্নতাবাদী ভেবে বসলো। 'বাঙ্গালী বাচ্চার এতো মেধা কেন ' এই বিস্ময় প্রকাশ করে হুকুম করলো ওর বাবা কোথায় ? বাবাকে নিয়ে এসো। বাবাকে ধরে আনতে হলো না, ভয়ে তিনি নিজেই আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন। খালি গা লুংগি পরা। বাবাকে কোন রকম প্রশ্ন করা হলো না। জামা গায়ে দিয়ে আসতে বলা হলো। জামা গায়ে ফিরে এলে বাবাকে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়া হলো। বড় মামা আর শফিক মামাকে পেটানো থামিয়ে তাদের দু'জনকেই টেনে হিচড়ে গাড়িতে তুলে ফেলা হলো।

সব ঘরদোর সার্চ হয়ে গেছে । হঠাৎ মেজরের মনে হলো বড় ঘরটাইতো দেখা হয় নি। সে নিজেই এগিয়ে গেলো নানীর ঘরের দিকে। নানী এতক্ষন ছেলেদের বাঁচাতে আহাজারী করেছেন, ওরা পাত্তাও দেয় নি। এবার তিনি দু হাত দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। মেজরের অবাক চোখে চোখ রেখে নানী বললেন তোমরাতো মুসলমান, মুসলমান পুরুষ হয়ে তোমরা কীভাবে মুসলমান নারীদের সার্চ করবে। আমার ঘরে মেয়েরা আছে তোমরা ওখানে যেতে পারবে না। হতচকিত মেজর নানীকে আস্বস্ত করতে চাইলো যে, ভয়ের কিছু নেই আমরা কোন ক্ষতি করবো না। নানীকে সরিয়ে দিয়ে মেজর নিজেই বড় ঘরে ঢুকলো। নানী তার পিছু পিছু। মশারী উঠিয়ে মেজর দেখলো মুক্তি সেনা নয় , পাখীর বাচ্চার মতন জরাজরি করে আছে ভয় আর আতঙ্কে নীল হয়ে যাওয়া তিনটি বাঙ্গালি তরুনি। বিপজ্জনক বয়েসি আমার তিন খালা। মেজর তার কথা রেখেছে। একটুও অসৌজন্য প্রকাশ না করে বাইরে বের হয়ে এলো। ইতিমধ্যে সৈন্যরা দুই মামা আর বাবাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। মেজর বলে গেলো ভয়ের কিছু নেই। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর কালই সবাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। আট মাসের যুদ্ধে আমরা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছি এভাবে যারা যায় তারা আর ফিরে আসে না।
দস্যুরা চোখের আড়াল হতেই মা আর নানী আছড়ে পরলেন মাটিতে। সবাই একসাথে কান্না শুরু করলো। পাছে কান্না শুনে ওরা আবার ফিরে আসে এই আতঙ্কে কান্নাটাও ঠিক ভাবে কাঁদতে পারছে না কেউ।
মা আর নানীর আহাজারীতে শেষ রাতের হিমেল হাওয়া আরো একটু আর্দ্র হলো বোধহয়।

পুরানো ঢাকার সেই চিরাচরিত সকাল আমার কাছে আজ বড় বেশী নতুন মনে হচ্ছে। বড় বেশী শান্ত চারদিক, এমন কী কাকের কর্কশ ডাকও যেন বড় বেশী কোমল মনে হচ্ছে। বড় ঘরে নানী, মা এবং সব খালারা সবাই কোরান শরীফ নিয়ে পড়তে বসেছে। এক এক জনের এক এক রকম উচ্চারনে কেমন এক ধরনের গোংগানীর মতন আওয়াজ হচ্ছে। সকাল হতেই আমার বড় দুই খালা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে চলে এসেছেন । একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্নার পালা শেষ হয়েছে এই মাত্র। পেয়াড়া গাছ তলায় প্রতিবেশীদের ভীড়। ঘটনা সবাই জেনে গেছে রাতেই, সকালের আল ফুটতেই সবাই এসেছে সমবেদনা জানাতে। এই

শান্তনা জানাবার ধরনও বিভিন্ন রকম। কেউ নানীর সাথে বসে গেছে কোরান শরীফ নিয়ে। এই বিপদে কেউ নিয়ে এসেছেন সকালের নাস্তা। বাকরখানি, জিলাপি আর পরটা। দুপুরের খাবারের আয়োজনেও বসে গেছেন কেউ কেউ। নেতৃ টাইপের মহিলারা মাকে বোঝাচ্ছেন এই মুহুর্তে কি করণীয়। কেউ বলছেন কোরান খতম করে ফেলো কেউ বলছেন পীর ফকিরের কাছে যেতে। তার জানা ভালো মারাত্নক ক্ষমতাবান পীর আছেন তার অসাধ্য কিছুই নেই। 'কাল সকালেই দেখবা অরা ফিরা আইবো'। এর মধ্যে একজন খুব বাস্তবমুখি উপদেশ দিলেন। তার মতে স্থানীয় মুসলিম লীগ এবং শান্তি কমিটির নেতা সিরাজুদ্দিনের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি কর, তিনি তাদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করলে করতেও পারেন। এখন একমাত্র ওরাই ভরসা। কথাটা মা'র পছন্দ হলো।

কান্নাকাটি একটু শান্ত হতে সবাই জানতে চায় কীভাবে কি হলো? একে বারে বিস্তারিত। মামাদের কেন ধরে নিয়ে গেলো সেটা মোটামুটি বোঝা যায়। মহল্লায় এই ভাইয়েরা আওয়ামী লিগের একনিষ্ঠ কর্মী। দেয়াল লিখন আর পোস্টার এখনো যা দৃশ্যমান আছে তা সবই শফিক মামার হাতের কাজ। মুসলিম লীগ কিম্বা শান্তি বাহিনীর কেউ হয়তো পাকিস্তানিদের খবর দিয়ে এনেছে। কিন্তু আমার বাবার মতন এমন শান্ত ,'গাইয়া জামাই' কে কেন ধরে নিয়ে গেলো তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আর তখনি আমার মা'র, খালাদের, নানীর তর্জনী তীরের মতন এসে আমাকে বিদ্ধ করে। ওর জন্য। ঐ হারামীর জন্য ওর বাবাকে ধরে নিয়ে গেলো। কেন ? ও কি করেছিলো? সেই একই কাহিনী বার বার বর্ণিত হতে থাকে। অতিরঞ্জিত হতে থাকে। আমার প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃনার দৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। আমি কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে যেতে থাকি। আমার প্রিয় মা'র দৃষ্টিতে স্নেহ মায়া মমতার বদলে আমি দেখতে পাই কেবলি ঘৃনা। কাছে গেলে দুর হ' বলে তাড়িয়ে দেয় । এক একবার মনে হয় মরে গেলে কেমন হয়। সাহস হয় না। আমি বাড়ীর বাইরে পা রাখি।

সকালের নরম রোদ এখন গন গনে আগুনে পরিনত হয়েছে। বাড়ী থেকে অনেক দুরে লক্ষ্মীবাজারে চলে এসেছি। এখানে কেউ আমাকে চেনে না। একরাতে রাজাকার আর বিহারীদের তাড়া খেয়ে আমরা এখানে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী এসেছিলাম। ইচ্ছাকরেই এখন আমি ঐ বাড়ী থেকে দুরে থাকি। গলি ঘুপচি মোটামুটি চেনা। এলো মেলো এগলি ওগলি ঘুরে বেড়াই। দুপুর গড়িয়ে যায়। গলির মোড়ে খোলা কল থেকে পানি খেয়ে ক্ষুধা আর তৃষ্ণাা একসাথে মেটাই। গলিতে নোংরা পোশাকের ছেলেদের সাথে মার্বেল খেলি।

হঠাৎ কান্নার শব্দে এক পুরানো বাড়ীর দরজায় আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাই। ভেতর বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। দু একজন পথ চলতি লোক ঢুকে পরছে বাড়ীতে। আমি ওদের সাথে পা মেলাই। চারদিকে উচু দেয়াল ঘেরা পুরানো বাড়ী। বেশ বড় শান বাঁধানো উঠান । বাড়ীতে লোকজন তেমন নেই, সব শহর ছেড়ে পালিয়েছে। উঠানের মাঝখানে একটা রক্তমাখা চাটাইয়ের ওপর চিৎ হয়ে আছে একটা মানুষের শরীর। এইমাত্র তাকে জিঞ্জিরা না কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

পাকিস্তানী আর্মি গত পরশু রাতে তাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। এরপর আর কেউ তাকে দেখেনি। আজ সকালে খবর পেয়ে বুড়িগংগার পাড় থেকে তুলে আনা হয়েছে। শুনে আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমার বাবা আর মামাদেরও তো এভাবে নিয়ে গেছে। তাহলে কী ওদেরও এমনি রাস্তার ধার থেকে তুলে আনতে হবে? আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে আসে। মৃত মানুষটাকে ঘিরে বসে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু মানুষ। একজন মাঝ বয়েসী মহিলা ছাড়া আর কেউ কাঁদছে না। দাঁড়ানো মানুষগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বুকের কাছে জমাট বাঁধা রক্তের মাঝ খানে বেশ বড় সড় একটা গর্ত। কয়েকটা মাছি সেখানে ঘোরা ফেরা করছে। আমার মাথা ঘুরে ওঠে। বমি পায়। দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরি। খাওয়া দাওয়া কিম্বা গোসলের কোন ঠিক ঠিকানা নেই অনেক দিন। আমার অবস্থা দেখে ছোট খালার হয়তো মায়া হয়। কূয়ার পাড়ে দাঁড় করিয়ে এক বালতি পানি মাথায় ঢেলে দিয়ে গোসল করিয়ে দেন । রান্না ঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে দেন। আমি চোখের জল আড়াল করে খেয়ে উঠি। কাউকে আর বলা হয় না আজ আমি কী দেখে এসেছি।

বাবা আর মামাদের ধরে নিয়ে গেছে অনেকদিন হলো। কোথাও তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। মা আর নানী এক মাজার থেকে আরেক মাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে যা বলছেন তাই করছেন। মানৎ, সদকা এসবের কোন হিসেব হিসাব নিকাশ নেই। শান্তি কমিটির নেতা সিরাজুদ্দিনের কাছেও বার কয়েক ধর্না দেয়া হয়ে গেছে কিন্তু কোন তথ্যই মিলছে না। আমি এলো মেলো ঘুরে বেড়াই এ গলি থেকে সে গলি। কাজী বাড়ীর মসজিদের দেয়াল ঘেষে পারিবারিক কবরস্থান। দিনের বেলাতেই কেমন গা ছম ছমে পরিবেশ। আমার বয়েসি কেউ এদিকে আসে না, আমি প্রায়ই আসি। পুরানো দালানের ছাদে, কার্নিশে গজিয়ে ওঠা বট আর অশ্বথ গাছের বেশ বড় বড় চারার পাশে বেশ ভাল ছায়া। স্যাঁতস্যাতে ছাদে উপুর হয়ে শুয়ে কালো পিঁপড়ের মিছিল দেখি। সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে ছোটা ছুটি করছে। আমাকে নিয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই। আমি চিৎ হই। পুরানো ঢাকা'র ইলেক্ট্রিকের তারের জটিল হিজিবিজির মধ্যে আমার মিরপুরের খোলা আকাশ ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। তারে ঝুলে থাকা রঙিন কাটা ঘুড়ির সাথে মরা বাদুর বাতাসে দোল খায়।

একদিন হঠাৎ খবর এলো বাবা আর মামাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা জেল খানায় নিয়ে এসেছে। চিন্তার আর কারণ নেই, এখানে অত্যাচার করে না। খুব শীগগীরই ওদের ছেড়ে দেয়া হবে। আমাদের নানীর বাড়ীর কাছেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। মা আর নানী জেল গেটে গিয়ে বসে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা।

৯ ডিসেম্বর সকাল বেলা কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়াই বাবা আর বড় মামা বাড়ি ফিরে এলেন। অনেকদিনের না কামানো দাড়ি গোঁফ আর ঝাকড়া চুলের মামা আর বাবাকে দেখে খুব অপরিচিত মনে হয়। কাছে যেতে ভয় হয়। মা আর নানী তাদের নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে আমরা ছোটরা আর তাদের কাছে ঘেসার

সুযোগ পেলাম না। বাইরে থেকে কোন আত্মীয় স্বজন এলে তাদের সাথে কথোপকথনের সময় তাদের উপর যে কী অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে তার খানিকটা বিবরণ আমরা পাই। একবার বড় মামা তার শার্ট খুলে আমার মাকে তার পিঠ দেখানোর সময় আমি সেখানে ছিলাম,সমস্ত পিঠ চাবুকের আঘাতে জর্জরিত। দেখে শিউরে উঠেছি। নির্যাতনের কারণে তাদের দু'জনেরই শরীরের অবস্থা যে খুবই খারাপ সেটা বাইরে থেকেই বেশ বোঝা যায়।
সবার আন্তরিক সেবা আর পরিচর্যায় বড় মামা আর বাবা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু তারা দুজনেই খুব চুপচাপ থাকেন, কথা বার্তা তেমন কারো সাথেই বলেন না, আমাদের সাথে তো নয়ই। এদিকে শফিক মামার কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছেনা। সেই প্রথম দিন থেকেই তাকে আর সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। তাকে নির্যাতনও করা হয়েছে আর সবার চেয়ে বেশী। কেউ বলছে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলে কেউ আর ফেরে না। আবার কেউ বলছে তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দেখা গেছে। আমরা কোন খবরটাকে যে গ্রহন করবো বুঝে উঠতে পারি না। স্বভাবতই শেষের খবরটা বেশী গ্রহনযোগ্য এবং এক সময় সত্যি জানা যায় যে শফিক মামাকে সেন্ট্রাল জেলেই রাখা হয়েছে। তাকে মুক্ত করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি দেখাও করা যাচ্ছে না।

১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান আকাশে চক্কর দিয়ে বংগভবনের উপর বোমা ফেললো। আমরা আবার অনেক দিন পর চৌকির তলায় আশ্রয় নিলাম। সবাই বলা বলি করছে যুদ্ধ শেষ হয়ে এলো বলে। পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা জানলা দিয়ে আকাশে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের আনা গোনা দেখি।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা, চারদিকে স্বাধিনতার গান বাজছে। দেশ স্বাধিন হয়ে গেছে। সারা দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহরের দিকে ছুটে আসছে। আতসবাজির মতন শব্দ করে ফুটছে সব মারনাস্ত্র। পাকিস্তানিদের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পন দেখার জন্য এই গোলাগুলির মধ্যেও মানুষ দল বেধে চলেছে রমনা রেসকোর্সে। বাধ ভাঙ্গা আনন্দে মানুষ ঘরের বাইরে বের হয়েছে। এতদিন সযতনে লুকিয়ে রাখা বাংলাদেশের পতাকা গুলো গর্বিত ভঙ্গিতে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরের সব রেডিওতে বাজছে দেশাত্মবোধক গান এত দিন যেসব গান আমরা শুনেছি স্বাধিন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, ভলিউম কমিয়ে, আজ সে সব গান হচ্ছে মাইকে। আবদুল জাব্বার গাইছেন হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। সে এক অবাক করা আনন্দের জোয়ার । আমাদের যাদের বাইরে বের হবার উপায় নেই তাদের জন্য আছে ছাদ। ঐ ছাদে চড়েই দেখলাম ধোলাই খালের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারীর কনভয় ফিরে যাচ্ছে। বৃষ্টির মতন আকাশে গুলি ছুড়ে আনন্দ করছে মুক্তিযোদ্ধারা আর শেষ সময়ে পালানোর সময় পাকিস্তানীরাও এলো মেলো গুলি ছুড়ছে। বাইরে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অল্প কিছুক্ষন পরই আমাদের নেমে আসতে হলো। ঘরের এক ছেলেকে জেলে রেখে আমাদের বাড়িতে স্বাধিনতার আনন্দ ঠিক জমে ওঠে না। রাতে শফিক মামার এক বন্ধু খবর নিয়ে এলেন, মুক্তিযোদ্ধারা রাজধানী পুরো নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিয়েছে। কাল সকালে ওরা জেলের তালা ভেঙ্গে সব বন্দী মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্ত করবে। সেই সাথে

আমাদের শফিক মামাও বন্দীশীবির থেকে মুক্ত হবেন। আমাদের মামা'র এমন নায়কোচিত প্রত্যাবর্তন, আমাদের ঠিক বিশ্বাস হয় না। সকালে মামা ফিরে আসবেন , উত্তেজনায় আমাদের কারোই ঘুম হয় না।
১৭ ডিসেম্বর সকাল থেকেই আমরা উন্মুখ হয়ে বসে আছি কখন মামা আসেন। অসময়ে হঠাৎ মিছিলের শব্দে আমরা গলিতে বের হয়ে দেখি ছোটখাট একটা মিছিল আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। শফিক মামাকে তাঁর বন্ধুরা কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে আসছে। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যারা হয়তো আজই রণাঙ্গন থেকে ফিরে যাচ্ছেন তাদের নিজ নিজ ঘরে তারাও যোগ দিয়েছেন এই মুক্তির আনন্দে। সেই জেল গেট থেকেই তারা এই মিছিলের সংগে আছেন। তাদের হাতে ঝক ঝকে স্টেন গান, কারো গলায় বুলেটের মালা, গ্রেনেড। দীর্ঘ দিনের না কাটা চুল দাড়িতে এক এক জনকে সন্যাসীর মতন লাগে। এতসব নিষিদ্ধ জিনিস এক সাথে দেখে আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। মুক্তিযোদ্ধা, অস্ত্রসস্ত্র না মামা- কাকে রেখে কাকে দেখি। সদ্য স্বাধিন বাংলাদেশের তিন রঙ্গা পতাকা মামার মাথায় জড়ানো। তিনি দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে দিয়ে যেন ভাসতে ভাসতে আসছেন। কালো আমার এই মামাকে আমি আর কখনো এত উজ্জল আর উচ্ছল দেখি নি। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই মুক্তির একটা আলাদা উজ্জলতা আছে, আজ জানা হলো। পেছনে অনেক মানুষ জন। অধিকাংশই এই মহল্লার মানুষ। মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা বাড়ির দরজায় পৌছেই আকাশের দিকে তাদের স্টেনগান থেকে একঝাক গুলী ছুড়লেন। মামার আগমন বার্তা। সে এক অদ্ভুত অবস্থা,গুলীর শব্দে কেউ আতঙ্কে ছুটে পালায় তো কেউ উল্লাসে চিৎকার করে। বাড়িতে ঢুকতেই সকালে গোয়ালের দিয়ে যাওয়া পুরো এক জগ দুধ নানী তার ছেলের মাথার ওপর ঢেলে দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে ছেলেকে বিপদ্মুক্ত করে এখন তাঁর স্বস্তির কান্না। কিন্তু মা'র কান্না দেখার মতন সুযোগ মামার তেমন মিললো না। গুরুজনদের কোন রকমে সালাম করেই মামাকে নিয়ে সেই মিছিল আবার পথে নামলো। এবার ভোজবাজির মতন কোত্থেকে যেন মিলিটারীর একটা খোলা জীপ জোগাড় হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা পতাকা লাগানো হলো এতে। আনন্দ মিছিলে গতি এলো ঠিকই কিন্তু আমরা হয়ে গেলাম আরো বেশী অবহেলিত। জীপে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মামাকেও নেয়া হয়েছে, উঠেছে মহল্লার আরো কিছু মানুষ সেখানে আমাদের জায়গা হবার কথা নয়। আমরা ক'জন বালক জীপটাকে ছুঁতে পারার আনন্দেই উদ্বেল। মিছিল চলছে পুরানো ঢাকার অলি গলি দিয়ে। আমরা জীপের যতটা কাছে থাকা সম্ভব তার চেষ্টায় ব্যস্ত। জয় বাংলা স্লোগানের সাথে সাথে জীপ থেকে আকাশে গুলী ছোড়া হচ্ছে অনবরত। কান ফাটানো ভয়ঙ্কর সেই শব্দে মানুষ ভয় পাবে কী আরো উল্লাসে ফেটে পড়ছে। রাস্তার পাশে আড্ডা দেয়া বুড়ো মানুষেরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরছেন
মুক্তিযোদ্ধাদের। এই শীত সকালে সেই সব অগ্নিপুরুষদের আলিঙ্গন করে ওরা যেন তাদের সব টুকু উষ্ণতা নিজেদের দেহে ধারন করতে চাইছেন। রাস্তার মানুষ স্বতস্ফুর্ত ভাবে এগিয়ে এসে যোগ দিচ্ছে এই মিছিলে। যা ছিল অল্প কিছু মানুষের মুক্তির মিছিল সেটা ক্রমশঃ বড় হতে হতে রূপ নিয়েছে জনগণের বিজয়ের আনন্দ মিছিলে। রোকন পুর, বাহাদুর শাহ পার্ক আর রায়সাহেব বাজার হয়ে নবাব পুরের দিকে মিছিল এগোতেই মামা হাত নেড়ে, চিৎকার করে আমাকে বার বার বাড়ি

ফিরে যেতে বলছেন । তিনি জানেন আমার পৃথিবী কতটুকু প্রস্বস্থ। এর বাইরে গেলে আমি হারিয়ে যেতে পারি - আনন্দ মিছিলের এই হট্টগোলের মধ্যেও আমার মামার তাই আশঙ্কা। কিন্তু আমি যে এখন এক নেশাগ্রস্থ বালক । পুরো জাতিকে মুক্তির আলোতে অভিষিক্ত করেছেন যারা সেই সব আলোর দীশারী আমার সামনে, আমার আর হারিয়ে যাবার ভয় কি ? দ্রুত ধাবমান আমার পায়ের তলায় একে একে হারিয়ে যেতে থাকে সব অলি গলি রাজপথ।

●

পাদটিকাঃ

আমি ইতিহাস লেখার চেষ্টা করি নি। একে শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বলা যেতে পারে, সেটাও আবার খুবই পারিবারিক। আমার এ লেখা আমার সময়ের মানুষের জন্য। মুক্তি যুদ্ধের সময় যারা নিতান্তই বালক কিম্বা কিশোর। চোখের সামনে সব দেখেছেন কিন্তু কোথাও কোন প্রকাশ নেই। (প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেই কারণ বয়স। বিস্ময়করভাবে যুদ্ধের ইতিহাস কিম্বা সাহিত্য যাই হোক , সেখানেও তাদের স্থান নেই।) সেই সব ভুলে যাওয়া মানুষের স্মৃতি যা সময়ের ধুলোর আস্তরনে ঝাপসা হয়ে আছে, তাদের ঐ নিস্প্রভ স্মৃতিকে খানিকটা উস্কে দেবার চেস্টা মাত্র। এটা পড়ে যদি কেউ মনের অজান্তেই বলে ওঠেন আরে ! এরকমতো আমিও দেখেছিলাম, তাতেই আমি সন্তুষ্ট । স্মৃতি সব সময় অথেন্টিক হয় না,কখনো কখনো তা হয় খুবই আবেগাক্রান্ত এবং এক পেশে। বিরক্তিকরও। এগুলো মনে রাখলে আমার এ লেখা কোন বিতর্কের কারন হবে না বলেই মনে হয়।